পাখির ছায়া

কিন্নর রায়

রামদা আমার হাতটা দেখতো — বলতে বলতেই অঞ্জন তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল রামচন্দ্র মাঝির দিকে।

তোঁকে তোঁ কঁত বাঁর বুঁইললাম। আঁবার দেঁখাবি!

পীযুষ দেখল অন্ধকারকে টুসকি মারা হারিকেনের আলোয় বসে আছে রামচন্দ্র মাঝি। পরনে ফুল হাতা নতুন শার্ট। ফুলপ্যান্টের পায়া বেশ খানিকটা গুটনো। একটা তিন ব্যাটারির ভারী টর্চ পড়ে আছে পাশে। লণ্ঠনের হলুদ আলোয় সেই টেপবাতির অ্যালুমিনিয়াম বডি একেবারে অন্যরকম।

তোঁকে বঁইললম এঁকটা পাঁখ মাঁরা বন্দুক —

তুই আয় এবার কলকাতায়। দোকানে নিয়ে গিয়ে পাখি মারা বন্দুক কিনিয়ে দেব। ভালো জিনিস। বলেই অঞ্জন বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকাল। একটু আগে লোডশেডিং হয়ে গেছে। বাইরে সমস্ত আঁধার জুড়ে জোনাকির টিপ টিপ বুটি — আলোবাহার। সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মন ভালো হয়ে যায়।

উঁয়ার থিঁক্যে ভাঁরী কিঁছু হঁয় নাঁই?

সবে চল্লিশ পেরন অঞ্জন বুঝতে পারে রামচন্দ্র মাঝি পাখি মারার রাইফেল বা এয়ারগানের থেকে জোরাল কিছু চাইছে। হারিকেনের ময়লাটে আলোয় রামচন্দ্র মাঝির কালো চেহারাটা কেমন যেন রহস্যময়। মাথার কমে আসা চুল, সাধারণের তুলনায় — যেমন শহরে দেখা যায় আর কি — বেশ উঁচু হনু ও খাপটা গাল, বসা — কোটরে ঢোকা চোখ — তার ওপর এই খানিকটা আনুনাসিক কণ্ঠস্বর — সব মিলিয়ে আমার চেয়ে বছর ছ-সাতেরবড় রামচন্দ্র মাঝি — আমাদের রামদা কেমন যেন বুড়োটে মেরে গেছে। ওদের ভাই-বোনেদের একটা পুরনো অসুখ আছে। একটু একটু করে পায়ের জোর কমে যাওয়া। রামদার একটা ভাই মারাও গেছে এই ভাবে। এক বোনও। রামদাও যখন হাঁটে — ইদানীং এই বলরামপুরে এলে রামদা যখন আসে আর চলে যায়, অঞ্জনের মনে হয় রামদাও পা টেনে টেনে হাঁটছে। শরীরটা সামনে একটু যেন ঝুঁকে পড়া।

তোর মাইনে কত এখন রামদা?

তাঁ হঁবে চাঁইর হাঁজারের উঁপর।

বোনাস পাস?

হঁ।

ফরেস্ট গার্ড রামচন্দ্র মাঝির সঙ্গে এমন নানা কথা হয় অঞ্জন ব্যানার্জির।

কাঁদ কি করছে?

বিঁহার পঁর যাঁ করে।

আর তোর অন্য ছেলেরা?

আঁছে সঁবাই — তুঁ আঁমায় এঁকটা ভাঁরী কিঁছু দেঁ —

কি করবি রামদা, ভারী বন্দুক নিয়ে?

টাঁলাইন দিঁব। ভাঁইলছে। দিন রাত ভাঁইলছে।

কেউ রামচন্দ্র মাঝিকে চোখে চোখে দিনরাত নজর রাখছে, তাকে গুলি করে মাটিতে ফেলবে রামচন্দ্র। এই কথা থেকে এটুকু বুঝতে পারল অঞ্জন।

তুই আয় কলকাতায়, তোকে ব্যবস্থা করে দেব ভারী কিছুর — তুই যেমন চাইছিস। নিদেনপক্ষে পাইপগান। বলেই অঞ্জন অন্ধকারে হাসল। তারপর বলল, নে হাতটা দেখে দে।

হারিকেনের আলোয় অঞ্জনের ডান হাতের পাতাটা খুব মন দিয়ে দেখতে দেখতে রামচন্দ্র বলল, কাঁইল সঁকালে — বাইরে অনেকখানি অন্ধকার। তার ওপর উড়ন্ত জোনাকির ডিজাইন।

আচ্ছা রামদা, তোর ওখানে ভালুক নামে এখনও ?

হঁ।

নেকড়ে ?

হঁ। চঁল নাঁ বঁটে।

যাব, যাব একবার গেঁড়ুয়ায় — তোর গ্রামে। তোর ওখানেই ভাত খাব। সেই কতদিন আগে গেছি।

জানেন তো দাদা, অযোধ্যা পাহাড় যাওয়ার পথে গেঁড়ুয়া। রামদার গ্রাম। সুন্দর ছিমছাম। আপনি মাঝে মাঝে বলেন না সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আমাদের পুলিয়া — এই বলরামপুরে এসে থাকবেন। থাকতে হলে গেঁড়ুয়ায় থাকতে হয়। শীতের দিনে ভালুক নামে। বন বরা।

পীযূষ চুপ করে অঞ্জনের কথা শুনছে। আটচল্লিশ হয়ে যাওয়ার পর বেশির ভাগ সময়ই তার কিছু ভালো লাগে না। কোথাও একটা চলে যেতে ইচ্ছে করে। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে। সেভাবে লেখালেখিও বোধহয় কিছু হলো না। ভাবতে ভাবতে লম্বা হাই উঠল পীযূষ ভদ্রর।

তখনই কি একটা গাড়ি বরাভূম স্টেশন ছুঁয়ে তার কামরার আলো আশপাশের অন্ধকারের গায়ে-মুখে মাখিয়ে দিতে দিতে ঝাড়খণ্ডের দিকে চলে গেল।

ডি এম ইউ গেল বোধহয়। বলেই একটু থেমে আবারও বলল অঞ্জন, নাহ, ডি এম ইউ হবে না। ডি এম ইউ হলে তো বরাভূমে থামত। চারপাশ আবার নির্জন। চুপচাপ। এমন কি স্টেশনের গা-লাগোয়া পুজো-প্যান্ডেলেও আলো না থাকায় সব কেমন ঝিম মেরে গেছে। জেনারেটর নেই। তাই মাইকও বাজছে না।

তোমাদের চা দেব? অঞ্জনের বউ সীমা এসে দাঁড়িয়েছে অন্ধকারে।

দাদা, আপনাকে চা ? সীমা আলাদা করে জানতে চাইল পীযূষের কাছে।

দাও। এখানে বসে তো কোনো কাজ নেই। চাই-ই খাই।

রামদা, তুই চা খাবি তো ?

হঁ — সীমার কথায় সোজা উত্তর রামচন্দ্র মাঝির।

আচ্ছা রামদা, তুই যে আমাদের ছোটবেলায় গল্প শোনাতিস — কুঁইচবরণ কইন্যা — তাঁর ম্যাঁঘ বঁরণ ক্যাঁশ —

হঁ।

সেই গল্পটা আবার বলতে পারিস।

রামচন্দ্র জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে রইল।

কিংবা সেই ছড়াটা —

ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ
বাপ থাইকতে ব্যাটার নাগুড়
তা কুড় কুড় তা

রামচন্দ্র এবারও কোনো কথা বলল না।

বাইরে অন্ধকার তেমনই ঘন।

মা কি শুয়ে পড়েছে? অঞ্জন জানতে চাইল সীমার কাছে।

না — এই যে আমি এখানে।

কি করছ মা তুমি, অন্ধকারে?
অন্ধকার কোথায়? এই তো হারিকেন জ্বেলে —
কি করছ কি তুমি?
মানা পীযূষ জ্যেঠুর পাঞ্জাবিটা কেটে ঠিক করে দিচ্ছে। জবাব দিল অঞ্জনের বড় মেয়ে তিন্নি।
তিন্নির গলা শুনে অঞ্জন জানতে চাইল, বোনা কোথায় রে?
ঘুমিয়ে পড়েছে। সবে এগারো পেরনো তিন্নির পরিষ্কার জবাব।
আমার আর সীমার দুই মেয়ে — তিন্নি আর মুন্নি। তিন্নি বড়। মুন্নি ছোট। তিন্নি এগারো। মুন্নি সাত।
মশারি টাঙিয়ে দিয়েছে ওকে? নইলে খেয়ে ছিঁড়ে ফেলবে। তার ওপর লোডশেডিং।
হ্যাঁ, দিয়েছি রে বাবা। মেঝেয় চায়ের কাপ নামাতে নামাতে সীমা তিন্নি মুন্নির বাবার দিকে কথাটা পাঠিয়ে দিল।
এই অন্ধকারের ভেতর আপনি পাঞ্জাবি ঠিক করতে বসলেন মাসিমা! চোখে স্ট্রেইন পড়বে যে। একে আপনার চোখ দিয়ে জল পড়ে।
ও পীযূষ, এই জল পড়া অনেক অনেক দিনের ব্যারাম। বুড়ো হচ্ছি না। এক এক করে তো সব যাবে। যাচ্ছেও। আসলে পাঞ্জাবির ডিজাইন, কাপড়ের প্রিন্টটা অ্যাত সুন্দর, কিন্তু কি রকম যেন বেঢপ হাইট। হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে এসেছে নিচে, অনেকখানি। দেখতে ভালো লাগে না।
আসলে বাংলাদেশ থেকে আনানো। মানে আমায় এনে দিয়েছে আর কি।
কে এনে দিল দাদা?
আমার বন্ধু — শামিম রেজা। কবি। 'আজকের কাগজ' বলে একটা ডেইলির শুক্রবারের পাতায় লেখে। বাংলাদেশে শুক্রবার শুক্রবার বেরয় সাহিত্যের সাপ্লিমেন্ট।
তাই?
হ্যাঁ অঞ্জন। ওদের ওখানে শুক্রবার ছুটির দিন। তারপরই আবারও বাইরে জোনাকি বোনা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই বলে উঠল পীযূষ, মেশিন নেই তো মাসিমা! কষ্ট হবে।
কিচ্ছু কষ্ট হবে না বাবা। মেশিন তো আজ এসেছে।
মানা তুই হাতে হাতেই সব করতিস আগে? জানতে চাইল তিন্নি।
হ্যাঁ তাই তো করতাম। যতদিন মেশিন কেনা হয় নি।
বাইরের ঘরে মেঝের ওপর বড় সতরঞ্চি পেতে তার ওপর বসে থাকা। এবার অক্টোবরের শেষাশেষি পূজো পড়ল, কিন্তু ঠান্ডা তো দূর অস্ত্ — এতটুকু শিরশিরানির চিহ্ নেই কোথাও। একদম ভাদ্র মাসের গরম। কি রোদ্দুর দিনের বেলা। আর সেই রোদের তাপ কি! সূর্যের দাপটে দিবারাত্র ঘাম। আর পারা যায় না। এমনিতেই ঘাম বেশি হয় অঞ্জনের। পীযূষেরও। বার বার গেঞ্জি বদল করেও সামাল দেয়া যায় না। পীযূষ তো ঐ জন্যে গরমে গেঞ্জি পরাই ছেড়ে দিয়েছে, বহু বছর হলো।
রামদা, আজ থাকবি তো রাতে?
সীমার কথায় ঘাড় নাড়ল রামচন্দ্র মাঝি। — নাহ, থাকবে না।
তোর কি ডিউটি আছে রাতে? অঞ্জন জানতে চাইল।
হাঁ।
তাহলে রাতে ভাত খেয়ে যা। সীমা বলল।
হুঁ।
অঞ্জন জানে রামচন্দ্র মাঝি এখান থেকে ভাত খেয়ে ফরেস্ট গার্ডের ডিউটি করতে চলে যাবে। বলেছে রামদা, এই পূজার সময় সবাই ছুটি নেয়। নেশা খায়। নেশা খেয়ে কামাই করে। রামচন্দ্র মাঝি সে রকম নয়। সে নেশা খায় না। খুব সিনসিয়ার। মন দিয়ে ডিউটি করে। নাইট ডিউটি থাকলে সকালে যতক্ষণ না রিলিভার আসবে, ততক্ষণ তার ছুটি নেই।
তুই একদিন গেঁড়ুয়া যাবি না রামদা?

রামচন্দ্র ঘাড় নাড়ল। — যাবে না।
তুই গেঁড়ুয়া গেলে তোর সঙ্গে চলে যেতাম। তোর বাড়ি ভাত খেতাম।
হুঁ।
ও রাম, ভাত খেয়ে যাস বাবা। ভেতরের ঘর থেকে বলে উঠলেন অঞ্জনের মা।
আমি বলে দিয়েছি মা রামদাকে। সীমা একটু গলা তুলেই বলল।
ও, তুই বলে দিয়েছিস। ঠিক আছে। বলতে বলতে অঞ্জনের মা প্রীতিকণা ব্যানার্জি আবারও পীযূষের পাঞ্জাবির নিচের দিকটা হাত-সেলাইয়ে ঠিক করার ব্যাপারে মন দিলেন।
আর পারা যাচ্ছে না গরমে। বলতে বলতে হাতপাখা তুলে নিল অঞ্জন।
হুঁ-অ-অ—বলেই তার সঙ্গে বড় করে হাই তুলল রামচন্দ্র মাঝি। হারিকেনের আলোয় সেই হাঁয়ের ভেতর এবড়ো-খেবড়ো কালচে দাঁত, ছ্যাতলা পড়া ময়লাটে জিভ দেখতে দেখতে গায়ের ভেতর জনার্দন দিয়ে কাঁটা কাঁটা জেগে উঠল অঞ্জনের।
তুই এখনও উল্টোপাল্টা ট্যাবলেট খেয়ে যাচ্ছিস রামদা?
হুঁ — শঁরীলটা জুঁতের নাঁই।
কি জুতের নাই! জুতের নাই বলছিস! কেন? দিব্যি খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, চাকরি-বাকরি করছিস, মাইনে বোনাস পাচ্ছিস। এটা তোর অভ্যেস, উটপটাং ট্যাবলেট খাওয়া। দোকানে গেলেই তোকে ট্যাবলেট দিয়ে দেয় না?
অঞ্জনের এই জিজ্ঞাসায় রাম চুপ করে থাকে।
এভাবে উইদআউট প্রেসক্রিপশন যে কোনো ওষুধ দেয় এখানে?
শুধু এখানেই বলছেন কেন পীযূষদা! কলকাতাতেও দেয়।
তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু রামদা এই যে নিজের মতো মুড়ি-মুড়কি খাওয়ার কায়দায় ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে, এতে ওরই ক্ষতি হবে।
সে তো জানি দাদা। কিন্তু কে বোঝাবে? বলেই অঞ্জন জোরে হাতপাখা নাড়তে থাকল। — ওফ্, কি গরম রে বাবা! এতক্ষণ হয়ে গেল আলোও আসে না। কি হলো রে বাবা — আরও জোরে জোরে হাতপাখা নাড়াতে নাড়াতে অঞ্জন বলে উঠল।
ভেতরের ঘর থেকে প্রীতিকণা বললেন, রাম বরাবরই এরকম। রোজ ট্যাবলেট খাওয়া চাই ওর।
প্রীতিকণার পাশে বসা তিন্নি ভেতরের ঘর থেকে বলে উঠল, বাবা জানো তো, পরশু দিন আমরা ওষুধের দোকানে গেছি মানার ব্যাথার ওষুধ আনতে, দেখি সেখানে রাম জ্যেঠু।
ওষুধ কিনছে নিশ্চয়ই! জানতে চাইল অঞ্জন। শোনই না আগে। রাম জ্যেঠু বেটনোভেট মলম কিনবে। কিছুতেই বোঝাতে পারছে না। শেষে হিজিবিজি কি একটা নাম বলল। আমরা কেউ সেটা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ওষুধের দোকানের কাকুটা ঠিক একটা বেটনোভেট মলম নিয়ে এসে হাজির। আর সেটা নিয়ে রামজ্যেঠু সঙ্গে সঙ্গে ওর শার্টের পকেটে পুরে নিল।
তুই বুঝতে পারবি না। কিন্তু ঐ ছেলেটা — যাকে তুই দোকানের কাকু বলছিস, ও ঠিক বুঝতে পারবে। কারণ ও যে রেগুলার তোদের রামজ্যেঠুকে ওষুধ সাপ্লাই করে। ব্যাপারটা ওর কাছে পুরোপুরি জানা।
ঘরে মশারির ভেতর মুন্নি কেঁদে উঠল।
ইস, গরম লাগছে মেয়েটার। বলতে বলতে সীমা তাড়াতাড়ি মশারির ভেতর ঢুকে গেল।
দাও না, একটু হাওয়া দিয়ে দাও মেয়েটাকে। বলতে বলতে অঞ্জন হাতপাখা নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল। আর তখনই আলো এল। স্টেশনের গা-লাগোয়া পুজো প্যান্ডেলে গাঁক গাঁক করে বেজে উঠল মাইক। মশারির ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সীমা। খানিক পরেই শাদা জিরে আর রসুন ফোড়ন দেয়া আড়হড় ডালের গন্ধে মাত হয়ে উঠল এ বাড়ির বাতাস।
ভাগ্যিস ঠাকুরদা বাড়িটা করেছিলেন। তাই তো এখানে বছরে অন্তত দুবার আসতে পারি। মাথার ওপর একটা ছাদ অ

াছে। ভাত ভাঙতে ভাঙতে বলল অঞ্জন।
তোমার দাদু তো গালা মার্চেন্ট ছিলেন!
হ্যাঁ লাক্ — লাক্ষা — গালা ব্যবসায়ী। তখন এই গোটা বেল্টটা জুড়েই তখন গালার কারবার। চাষ। ঠাকুরদা খুব ইনটারেস্টিং মানুষ ছিলেন। দাপুটেও। বন্দুক ছিল। মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারতেন। বাঘ, ভাল্লুক, নেকড়ে — সব মেরেছেন। বাঘ পুষেছিলেনও বাড়িতে। ভাল্লুক। ময়ূর। মা-ও তো দেখেছে ঠাকুরদার পোষা ভাল্লুক, পোষা ময়ূর।
সেই ময়ূর সর্ষের তেল খেত। বাইরের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন প্রীতিকণা।
সর্ষের তেল খেত মানে?। কথাটা বলেই একটু যেন নড়েচড়ে বসল পীযূষ।
হ্যাঁ, রোজ দুপুরে দু ছিপি করে সর্ষের তেল — আমার মা — মানে এ বাড়ির শাশুড়ি-মা দিতেন।
ছাড়া থাকত না কি?
ছাড়াই তো ছিল। পুরোপুরি ছাড়া। খালি রাতে খাঁচার ভেতর। সকালে উঠে ছেড়ে দিতেন বাবা — আমার শ্বশুরমশাই। পীযূষের জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন প্রীতিকণা। তারপর একটু থেমে বলে উঠলেন, ঠিক মাপা দু ছিপি করে সর্ষের তেল। প্রত্যেক দিন দুপুর বেলা।
নেশা হয়ে গেছিল বোধহয়।
তাই হয়ত হবে। না হলে রোজ নিয়ম করে আসত কি করে? সে তো এদিক-ওদিক চরে বেড়াত। কিন্তু ঐ সর্ষের তেল খাওয়ার সময়ে ঠিক হাজির হয়ে যাবে।
আর ভাল্লুক?
সে আর ব'ল না পীযূষ। গলায় চেন দিয়ে বাঁধা থাকত রান্নাঘরের খুঁটির সঙ্গে। দুধ-ভাত খেত। আরও কি কি সব খাবার তাকে দিতেন বাবা। উইপোকার ডিম। পিঁপড়ের ডিম। মধু।
রামদা, এখন ভাত খাবি তো? তোর তো এবার ডিউটির সময় হয়ে যাচ্ছে।
হুঁ। সীমার কথার উত্তরে বলল রাম।
পীযূষ দেখল সিমেন্টের মেঝের উপর উবু হয়ে রামচন্দ্র মাঝি ভাত খেতে বসেছে।
সকালে হনুমাতা নদী, ধোপবাঁধ হয়ে ঘুরে এসেছে পীযূষ। হনুমাতা নদীর পাড়েই শান। কোনো নতুন জায়গায় গেলে সেখানকার শানটাও দেখে নেয় পীযূষ।
এখানে বড় পুকুরকে বাঁধ বলে।
এই ধোপাবাঁধ অব্দি ছিল আমাদের চাষের জমি। সে জমি সব চলে গেছে। দাদুর — মানে ঠাকুরদার আমলে ছিল এ সব। তখন দিনকাল অন্যরকম। ঠাকুরদা দাপটে চলতেন। বৃটিশ আমলে ডি এম. , এস পি. — সব বন্ধু। এক সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-আাদ। বুঝতেই পারছেন। বলেই অঞ্জন সামনের জমির দিকে তাকাল।
ধোপবাঁধের কাছাকাছি বড় রাস্তা থেকে নেমে মাঠ পেরিয়ে একটু যেতে হবে — একটা লাল টালির বাংলো। মাটির দেয়াল। সামনে পায়ে চলা রাস্তা। পেছন দিকে উধাও মাঠ। অঞ্জনের বার বার বলা বুড়া-বুড়ি, ছোট কানা বড় কানা — দুটো দুটো চারটে পাহাড়। তাদের গায়েই প্রায় ওয়াকারস টেবল — অরণ্যদেবের খুলিগুহা — এনামটাও অঞ্জনেরই দেয়া। হঠাৎ দেখলে রোদে-ছায়ায় কেমন যেন মনে হয় কমিকসের পাতা থেকে উঠে আসা অরণ্যদেবের সেই খুলি গুহা।
এরকম একটা বাড়ি — জানো তো অঞ্জন — ঠিক এরকমই একটা বাড়ি মনে মনে ভাবি। যদি থাকতাম যদি থেকে যেতে পারতাম সেখানে। সকালে উঠে বেড়াতে বেড়াতে পেরিয়ে যাওয়া ফাঁকা মাঠ, হনুমাতা নদী। সূর্যশিশির কিংবা চিন্তামণির পাতার ওপর ভোরের প্রথম রোদ। হাঁটতে হাঁটতে যদি পৌঁছে যাওয়া যায় ছোট কানা, বুড়া-বুড়ি — আর কি চাই বল তো!
বললেন পীযূষদা, সব ঠিক। আমারও এক এক সময় মনে হয় কি আছে শহরে! সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে আসি এখানে। বলরামপুরের বাড়িতে থাকি। তারপরই ভাবি মেয়ে দুটো-তিন্নি আর মুন্নিদের এডুকেশন। পারবে কি ওরা নতুন করে এখানে অ্যাডজাস্ট করে নিতে! শরীরটাতো আর তেমন তাজা নেই।
তাছাড়া আমার কোমর, হাঁটুর ব্যাথা। সীমার পিঠে ব্যথা, কোলাইটিস। পারব কি আমরাএখানে মানিয়ে নিতে?

সে তুমি খানিকটা ঠিকই বলেছ। কিন্তু এখানে চলে এলে দেখবে অনেক কিছু ঠিক হয়ে যাবে। বউ, ছেলে, মেয়ে, বাবা-মা থাকলে পরে একট বাঁধন তৈরি হয় সেই রকম কোনো বন্ধনই তো নেই আমার। মুক্তপুষ যাকে বলে, তাই একরকম।
কিন্তু শরীরটা তো পুরনো হচ্ছে পীযূষদা।
তা তো হচ্ছে। তবে দেখ, এখানকার জল-বাতাস, রোদ, চাঁদের আলোয় টাটকা তাজা হয়ে উঠব। নবীন হব আরও। ড াইজেশনের সমস্যা হবে না। অফুরন্ত খিদে। শান্তির ঘুম। আবার কি চাই?
আপনার লেখালেখি, কলকাতার কনট্যাকট!
জীবন করতে করতে নতুন লেখালেখি উঠে আসবে। তখন কলকাতাই ব্যস্ত হয়ে উঠবে আমার সঙ্গে কনট্যাকট রাখার জন্যে। আর তা যদি না হয়, হলো না। বেশ আনন্দে, শান্তিতে থাকব। সেটাও কম নয় কি! টেনশন ফ্রি বেঁচে থাকা। সে কি কম আরামের? জীবন তো একটাই অঞ্জন।
দূরে ছোট কানা বড় কানার মাথায় আলোছায়ারলুকোচুরি। নিচু মাঠ থেকে খানিকটা ঢালু উঁচু জমি পেরলে রেল ল াইন।
একটু দেখে হাঁটবেন পীযূষদা। চার দিকেই কিন্তু ন্যাচারাল ল্যাট্রিন, ইউরিনাল। দেখে পা ফেলবেন। রেল লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে বলল অঞ্জন।
পীযূষদা আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করল সেই মাটির দেয়াল আর লাল টালির ছবি ছবি চেহারার বাড়িটা চে াখে পড়ে কি না। দেখা গেল না। উল্টো দিকে ছোট কানা, বড় কানা, বুড়া-বুড়ি, ওয়াকারস টেবল যেমন ছিল তেমনই। বরং মাঝখানে একটা আখাম্বা চারতলা হোটেল উঠেছে। কুৎসিত।
দেখেছেন পীযূষদা, কোনো সেন্স আছে। বিউটি সেন্স তো নেই-ই। কমন সেন্সও না। এরকম একটা সুন্দর জায়গায় কেউ অমন একটা আখাম্বা স্ট্রাকচার খাড়া করে? অবনকসাস। বলে খানিকটা থুথু রেল লাইনের ঢালাই স্লিপারের ওপর ফেলল অঞ্জন।
বাড়ি ফিরে রামচন্দ্র মাঝির জ্যোতিষ চর্চার ভেতর পড়ে গেল অঞ্জন আর পীযূষ। সীমা হাত দেখিয়ে তখন সবে উঠে গেছে। অঞ্জন বসল দেখাতে।
কিছু বল রামদা!
নাঁম যঁশ খুঁব হঁবেক।
তাই?
খঁরচা হঁবে অঁনেক।
তবু ভালো। খরচা হবে মানে তাহলে ইনকাম হবে। ইনকাম না হলে খরচা করব কি করে রে রামদা? বলেই হাসল অঞ্জন।
হুঁ। হঁবেক হঁবেক। ইঁনকাম হঁবেক।
এই দাদাটার বল তো! হাত ভালো করে দেখে বল।
কি হবে অঞ্জন! আমার ওসবে তেমন বিশ্বাস-টিশ্বাস নেই।
দেখান না দাদা। বিশ্বাস কি আমারও খুব কাছে! কিন্তু সময় কেটে যায়। শেষের দুটি বাক্য অবশ্য নিজের ভেতরে বলল অঞ্জন।
বলছ! আচ্ছা, দেখুন তো রামদা।
পীযূষদার হাতটি কোলের ওপর নিয়ে খুব ভালো করে দেখল রামচন্দ্র। তারপর বলল, হুঁ। ইঁয়ার গুঁ বঁল খুঁব। নাঁম যঁশ খুঁব হঁবেক।
তুই দাদার বিয়ে ছেলেপিলে দ্যাখ রামদা।
ইঁয়ার বিয়াঁটো একটু গড়বড়। কিন্তু বাঁচচা তিনটোঁ। হুঁ তেনটোঁ বাঁচচা।
অঞ্জন সীমা দুজনে মুখ টেপাটেপি করে হাসছে। সীমা জানে পীযূষদা বিয়েই করেন নি। তায় আবার বিয়ে নিয়ে ঝঞ্ঝাট! সেই বিয়ের সঙ্গে আবার তিনটে সন্তান। বাববাঃ! রামদা পারেও।
বিঁয়াটো গড়বড়। তিঁনটে বাঁচচা শুনে ভেতরে ভেতরে শীতের হাওয়ার বয়ে যাওয়া টের পেল পীযূষ। শাশ্বতীর সঙ্গে থাকা।

এক সঙ্গে থাকা। অনেক অনেকগুলো বছর। তিনটে অ্যাবরশান। তিন বার অ্যাবরশান। দুবার শাশ্বতী। একবার নিনা — ম ায়ের মাসতুতো বোনের মেয়ে। তখন অনেক কম বয়স আমার।

রামচন্দ্র মাঝির কথা শোনা মাত্র তিনটে মানুষ-ভ্রূণ ছাল ছাড়ান মুরগির চেহারা নিয়ে লাফ দিয়ে ধরে ফেলল পীযূষের দু হাত। গলা। খালপোষ করা মুরগিদের মাথা, মুণ্ডু, ঠোঁট — কিছুই থাকে না। কিন্তু মুণ্ডু কেটে নেয়ার পরও একটা রক্ত ম াখা লম্বা গলা থাকে। আঁকাশি চেহারার সেই গলা মোচড় দিতে লাগল পীযূষের দু হাতে। গলায়।

বাইরে রোদ বাড়ছে। সঙ্গে গরমও। মুখে হাসি টেনে এনে পীযূষ বলল, এখনও গড়বড় বাকি আছে বিয়ে নিয়ে? বলতে বলতে খানিকটা শুকনো মজা করতে চাইল পীযূষ।

রামচন্দ্র মাঝির কোনো দিকে মন নেই। এক দৃষ্টে হাতের চেটো দেখছে পীযূষের।

তা বাচচাদের লেখাপড়া? তাদের উন্নতি? জিজ্ঞাসা করল পীযূষ।

বঁইলতে পাঁরব নাঁই — বলেই হাত সরিয়ে দিল রামচন্দ্র।

কেন জানি না নবমীর সকালে, বারভূম স্টেশনের গায়ে পুজো প্যান্ডেল থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্দ মনটা অন্যরকম করে দিল।

বহু বছর পর নিনাকে মনে পড়ে গেল। রোগা। পাতলা পাতলা গড়ন। বড় বড় চোখ। বেশ লম্বা। ফরসা নয়, আবার ক ালোও বলা চলেনা। আমরা সবাই শীতে এক সঙ্গে মধুপুর গেছিলাম। একটা বড় বাড়ি ভাড়া করে থাকা। বাড়িটায় ইলেকট্রিক নেই। সন্ধের পর পুরো বাড়িটাই রূপকথার।

আমি সেবার ইলেভেনে উঠব। নিনা হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। আজ থেকে তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর আগে। নিনা আমার থেকে বছর তিনেকের বড়। কিন্তু কিছুতেই ওকে দিদি বলতে পারতাম না। এই মধুপুরেই কি বাহান্ন বিঘের বিখ্যাত বাগ ান? কেমন জল মাখান কাচের ওপারে মনে হয় সেই সময়, সেই মধুপুরকে। তখনই কি 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা'-র স্বপ্ন দেখা ছেলেরা গ্রামে যেতে শু করেছে?

কি সুন্দর সকাল-বিকেল মধুপুরের। তেমনি বড় সেই বাড়ি। আলিশান ছাদ। বাড়ির খিলান, থাম, সামনের বাগান, মরচে ধরা লোহার গেট — সবেতেই পুরনো দিনের গন্ধ। চমৎকার গানের গলা নিনার — এ পরবাসে রবে কে হায় — হা-অ া-আয় বলে তার টান একেবারে অন্যরকম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যাওয়া। ছাদের ফাটা কার্নিশ, ভাঙা আলসেতে প ায়রার কূজন। তখন ভরা দুপুর । দূর থেকে ঘুঘুরাও উড়ে আসে। রাতে পায়রা ধরে নিতে চুপিসারে আসে ভাম। সকালে কোনো কোনো দিন শুকনো রক্তের দাগ, পায়রার পালক পড়ে থাকে শ্যাওলা ধরা কার্নিশের পাশে। ছাদের গায়ে। কা র্নিশের এদিক-ওদিক নবীন বট আর অশ্বত্থের চারা।

চাঁদের আলোয় ছাদে অনেকক্ষণ বসে থাকতে ইচেছ করে। কিন্তু শীত। তাই পারা যায় না। ছাদে কোনো কোনো দিন নিনা পরী হয়ে যায়। দূরে তখন কোকিল ডেকে ওঠে।

সেই লোম ছাড়ান মুরগি চেহারায় ভ্রূণেরা পীযূষের গলায় ফাঁস দিয়ে আবার বসে। এরই নাম কি স্মৃতি? সময় পেরিয়ে আসার কষ্ট? বয়েস হওয়া?

ভাত খাওয়ার পর কুয়োতলা থেকে আঁচিয়ে আসে রামচন্দ্র মাঝি।

চান করবেন তো পীযূষদা?

করব।

চলুন তেল মাখি।

চানের আগে তেলমাখা অঞ্জনের একটি প্রিয় বিষয়।

আচছা, এই কুয়ো কত গভীর?

অনেক অনেক ফুট। আসলে এটা তো পাতকুয়ো নয়, ইঁদারা।

ও।

এটা তো পাথর ফাটিয় তৈরী করা। বহু গভীর।

কীভাবে পাথর ফাটানো হলো?

ডিনামাইট দিয়ে ব্লাস্ট করিয়ে।
তাই!
হ্যাঁ।
কে কাটিয়েছিলেন এই ইঁদারা, তোমার ঠাকুরদা?
না না তারও বহু বছর আগে। ঠাকুরদা তো এ বাড়ি কেনেন রেল কোম্পানির কাছ থেকে।
সিমেন্টে বাঁধানো ইঁদারাটার মাথার ওপর দুটি বড় বড় লোহার কপিকল-চাকা, দড়ি বালতি ফেলে জল তোলার জন্যে। সবটা দেখতে দেখতে চুপ করে রইল পীযূষ। ইঁদারার চারপাশে সিমেন্ট দিয়ে গোল করে পাকা করা। সেখানেও সময়ের দাগ। ফাটল। কাপড় কাচা, বাসন মাজা, দাঁড়িয়ে বসে চান করার জায়গা। কত বছর আগে তৈরি হয়েছিল এই ইঁদারা? পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি —। ভাবতে ভাবতে পীযূষ হঠাৎ দেখতে পেল রামচন্দ্র মাঝি টক করে কুয়োর ওপর উঠে বসল। তারপর গট গট করে নেমে গেল ইঁদারার ভেতর।
এই — এই — জোরে চিৎকার করতে গিয়েও পারল না পীযূষ। সত্যি সত্যি কি ভেতরে নেমে গেল রামচন্দ্র মাঝি? ঠিক করে কিছু বুঝে উঠতে পারল না পীযূষ।
গায়ে ভালো করে সর্ষের তেল ডলতে ডলতে অঞ্জন বলল, জানেন তো পীযূষদা, রামদা ঐ যে গল্প বলত না আমাদের — কুঁচ বরণ কইন্যা —
হ্যাঁ তুমি বলছিলে — কেমন যেন আনমনা হয়ে বলল পীযূষ। তার মাথার মধ্যে তখন পুরোপুরি রামচন্দ্র মাঝি। লোকটা চোখের সামনে দিব্যি নেমে গেল ইঁদারায়।
সেই গল্পে — ঐ 'কুঁচ বরণ কইন্যা'র মধ্যেও একটা চাপা সেক্স থাকত।
তাই?
হ্যাঁ। রাজকন্যাকে ধরে তার পাছার কাপড় তুলে বেতের বাড়ি মারছে তার বাবা। এসব আপনি কোন রূপকথার গল্পে প াবেন দাদা? এ ছাড়া আরও আছে। নানা রকম স্যাডিস্টিক মারধোর। রামদা খুব রসিয়ে রসিয়ে তার বর্ণনা দিত। তখন বয়েসটা কম। অতশত বুঝতে শিখি নি। খুব মন দিয়ে শুনতাম — চোখ বড় বড় করে সেই সব গল্প। এখন খানিকটা দুরত্ব তৈরি হয়েছে। বয়েস বেড়েছে। নতুন করে ভাবার চেষ্টা করি।
ইঁদারার জল বেশ ঠান্ডা। বালতি করে তুলে চানে বেশ আরাম। দুজনে দুজনের চানের জল তুলে দিচ্ছে। এমন করেই রে াজ স্নান করে পীযূষ আর অঞ্জন। কিন্তু রামচন্দ্র মাঝি কোথায় গেল! সে যে সটান নেমে গেল কুয়োর ভেতরে বার বার খচ খচ করতে লাগল পীযূষের। হাত দেখতে দেখতে রামচন্দ্র তিনটে বাচচা আর বউ নিয়ে গড়গড় বলে শান্তী আর নিনার গল্প তৈরি করে দিয়ে গেল মনের ভেতর। আদৌ কি নিনা বলে ছিল কেউ, কিংবা শান্তী? মায়ের মাসতুতো বোনের মেয়ে নিনা, যে আমার থেকে সত্যি সত্যি কি বছর তিনেকের বড় ছিল? তাকে 'দিদি' না বলে নাম ধরে ডাকতাম সত্যি সত্যি? কিংবা ওসব কিছু নয়। মধুপুরে কি সত্যি সত্যি সবাই মিলে গেছিলাম আমরা ১৯৬৭-৬৮ সালে?
বলতে গেলে সকাল বেলা রামচন্দ্র মাঝি আমার হাত দেখে ভেতরে অনেকগুলো গল্প তৈরি করে দিয়ে গেল। কিংবা গল্প নয়। সবটাই সত্যি। ঐ তো দেখতে পাচ্ছি আমি মধুপুরের সেই বিশাল বাড়িটার সামনে পাঁচিল ঘেরা ছায়াচ্ছন্ন বাগান। সেখান অনেক অনেক আতা গাছ। পেঁপে গাছ। একটা গোলাপজামের গাছও সেখানে। কি সুন্দর পাখি আসত পাকা অ াতা খেতে। বাগানে বড় বড় বেজি ছিল। আর কাঠবেড়ালি।
কি পীযূষদা, গায়ে জল ঢালবেন না আর?
হ্যাঁ, ঢালব।
আমি তুলে দি।
দেবে! দাও।
আপনি করে নিন। তারপর আমায় একটু তুলে দেবেন আপনি।
দেব।
অঞ্জনের তোলা জল বেশ কয়েক বালতি গায়ে ঢেলে ঝরঝরে হয় শরীরটা। গামছায় গা মুছে কপিকলে জড়ানো দড়ি বাঁধ

া বালতি ফেলে জল তুলতে গিয়ে পীযূষ দেখতে পেল উঠে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করল। শুশুক যেমন ডোবে-ওঠে, তেমনই ডুবছে আর উঠছে ফিটাস তিনটে। উঠছে আর ডুবছে।

কুয়োর বালতি করে ইঁদারা থেকে জল তুলতেই পীযূষ দেখল টকটকে লাল — যেন বা রক্ত এক বালতি, ভর্তি হয়ে রয়েছে। ভয়ে গলা দিয়ে চীৎকার বেরিয়ে আসতে চাইছে। কোনো রকমে নিজেকে সামলে ইঁদারার ভেতর ঝুঁকে পীযূষ দেখতে পেল ভ্রূণ তিনটের একটাও নেই। কিন্তু রামচন্দ্র মাঝির মুন্ডুটুকু জেগে আছে জলের ওপর।

জলে ভাসা রামচন্দ্র মাঝির মাথা একবার ঘাড় উঠিয়ে আকাশের দিকে চোখ খুলে তাকিয়ে অপরিচ্ছন্ন সমস্ত দাঁত মেলে ধরল একসঙ্গে। তারপর চোখ বুজে আবারও মুখ নিচের দিকে নামিয়ে নিল।

জলের ভেতর কি দেখছেন? জল-মাকড়সা হয়েছে অনেক। বহুদিন পরিষ্কার হয় না। নিজে না দেখলে যা হয়। ভাড়াটের ওপর ভরসা করে কি কিছু হয়! শিবুদারা কিছুই দেখে না। ঐ থাকে ঐ পর্যন্তই। জল তুলেছেন — দিন আমায়, বলে ব ালতি সমেত জল মাথায় ঢেলে দিল অঞ্জন।

তুমি বালতিটা আমায় দাও। তুলছি। বলে হাত বাড়াল পীযূষ।

নিন। নিন না। বলেই কুয়োয় বালতি বাড়িয়ে দিল অঞ্জন।

কপিকল দিয়ে কুয়োয় ভেতর বালতি ফেলতে ফেলতে আবারও রামচন্দ্রের পাতলা চুল সমেত মাথাটি জলের ওপর ভেসে থাকতে দেখল পীযূষ। পুরনো কচুরি পানার শেকড় যেমন হয় জলে ভিজে, রামচন্দ্র মাঝির মাথার চুলেরা তেমনি লেপটে পেতে রয়েছে।

পীযূষকে দেখেই বোধহয় রামচন্দ্র আবারও আকাশের দিকে চোখ করে এবড়ো-খেবড়ো ময়লা দাঁতের পাটি দেখাল।

এরকম দেখতে দেখতে পীযূষ তো পাগল হয়ে উঠবে। একটার পর একটা গল্প তৈরি হচ্ছে। নাকি নিজেই গল্প হয়ে যাচ্ছে পীযূষ!

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পীযূষ দেখল অঞ্জন সাবান মাখছে। সাবানের সুঘ্রাণ মিশে যাচ্ছে আশপাশের বাতাসে। একটা দোয়েল খুব মন দিয়ে পোকা খুঁটছে ঘাসের মাথায়। কুমড়ো লতার সবুজে হলুদ আর কালো রঙের দুটি প্রজাপতি নিজের মনে দোল খেতে খেতে আরও কোথাও উড়ে গেল।

মুখে সাবান মাখছে অঞ্জন। চোখ বুজে ঘষছে সাবান। এখনই জল তোলা দরকার। ভেবেই দড়ি সমেত বালতি কুয়োর গভীরে নামিয়ে দিল পীযূষ। আর এবার তার বালতিতে তিনটি অপুষ্ট প্রাণের একটি লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল।

কি বিপদ রে বাবা!

পীযূষদা জল।

খুব তাড়াতাড়ি বালতি টেনে তুলল পীযূষ। আর তা সরাসরি মাথায় ঢেলে দিল অঞ্জনের।

কোথায় গেল সেই বাড়তে না পাওয়া জীবনটা! মাংস পিণ্ড? আশপাশে তাকিয়ে কোথাও তাকে খুঁজে পেল না পীযূষ।

সাবান-শ্যাম্পুতে জলে অঞ্জনের মাথার চুল লেপটে বসে গেছে তার খুলির সঙ্গে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে একটা বেগদার মতো মুদ্রা তৈরী করে মুখের জল কাচাল অঞ্জন।

পীযূষ এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে আবারও দড়ি-বালতি নামিয়ে দিল জলে। আর এবার রামচন্দ্র মাঝির আস্ত মুণ্ডুট াই উঠে এল বালতিতে। সঙ্গে সেই টকটকে লাল জল। সামনের বড় বালতিতে জল ঢালতে ঢালতে পীযূষ কোনো ভাবেই রামচন্দ্র মাঝির মুড়ো দেখতে পেল না।

এই তো রামদা — তোর কি ওভারটাইম চলছে এখন?

রামচন্দ্র কোনো কথা না বলে হাসল।

তার মাথার চুল কি ভিজে? জল গড়াচ্ছে কি সেখান দিয়ে? পীযূষ ভালো করে নজর করে দেখল। সেভাবে কোনো চিহ্ ফুটে ওঠা চোখে পড়ল না।

রামদা ভাত খাবি তো?

হুঁ।

তাহলে বসে যা।

সীমা বলল, রামদা এখানে দুপুরে খাবে আমি বলে দিয়েছি। মা-ও বলে দিয়েছেন।
কি রে রামদা, তোর পায়ের ব্যথা কেমন?
আঁছে আঁইজ্ঞা।
কতটা? কেমন ব্যাথা! হাঁটতে পারিস?
পাঁরি আঁইজ্ঞা। এঁকটু অঁসুবিধা হঁয়।
ওষুধ খাচ্ছিস।
হঁ টেঁবলেট বঁটেক।
তুই চল কলকাতায়। তোকে বড় ডাক্তার দেখিয়ে দেব।
ছুঁটি নাঁই আঁইজ্ঞা।
ছুটি নে। ভালো করে ডাক্তার না দেখালে তুই তো আরও ঝামেলায় পড়বি।
আঁইজ্ঞা।
পীযূষ কিছুই বুঝতে পারছে না। সকালে হাত দেখার পর নিনা শাশ্বতীদের গল্প, তারপর রামচন্দ্র মাঝির কাটামুণ্ডু ইঁদারার জলে ভেসে থাকা, ইঁদারার জলের রঙ লাল — একবার রক্ত যেন হয়ে যাওয়া — সবটাই কি গল্প?
এখন তো শাশ্বতীর সঙ্গে নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকার সময়টাও অল্প অল্প মনে পড়ছে। ল্যান্ডলেডি একজন বয়স্কা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। তিনি বেশ ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন। তাঁর একটা লোমঅলা কুকুর ছিল। কুকুরটা গায়ের রঙ পাটকিলে। তার গায়ে পোকা হয়েছিল কোনো এক বর্ষায়।
রোমান ক্যাথলিক সেই ল্যান্ডলেডি সন্ধ্যের পর একদম অন্যরকম হয়ে যেতেন। লোডশেডিং হয়ে গেল মোমের হলুদ আলোয় তাঁর মুখখানা সম্পূর্ণ মোমের তৈরি মনে হ'ত।
মাঝে মাঝে ছাদে উঠতেন মিসেস রবার্টসন। সেই ছাদের কার্নিশের ধারে ধারে ধুলোমাখা ফার্ন। ফাটলে ছোট ছোট আরজিনা সাপের বাচ্চা। বড়ও ছিল নিশ্চয়। আকাশের ফালি চাঁদ উঠে এলে বাড়ির পুরো ছাদটাই অন্যরকম হয়ে যেত।
চাঁদের আলোয় একা একা বসে থাকেন মিসেস রবার্টসন। তাঁর দুই ছেলেই অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছে। এক মেয়ে মারা গেছে। স্বামী নেই বহু বছর। চাঁদের আলোর নিচে বসে বসে নিজের মৃত মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেন মিসেস রবার্টসন। একা একাই বিড় বিড় করতেন কত কিছু।
সাত-আট বছরে মারা গেছে সেই মেয়ে। সম্ভবত স্মল পক্সে। মারা যাওয়া মেয়েটির ফ্রক, খেলনা — সব যত্ন করে সাজানো আছে মিসেস রবার্টসনের কাছে। তার থেকেই একটা-দুটো নিয়ে ফাঁকা ছাদে চাঁদের আলোর মধ্যে চলে আসেন তিনি। সেই বাচ্চাটির ফ্রক, পাউডার কৌটো, চিনি, খেলনা — সব গুছিয়ে রাখেন।
এইবার সে আসবে। আসবে।
ভাবতে ভাবতে কথা বলেন মিসেস রবার্টসন।
নিনার চাপে শাশ্বতীর সঙ্গে এক সঙ্গে থাকার গল্পটা ভুলতে বসেছিলাম প্রায়।
মিসেস রবার্টসন খুব সুন্দর পুডিং বানাতে পারতেন। আর কেক। আমরা বহুবার তাঁর হাতের কেক, পুডিং খেয়েছি। এমন কি আমাদের বিয়ে-না হওয়া দাম্পত্যে ফাটাফাটি ঝগড়া হলে অনেক সময় শুধু কেক, পুডিংয়েই খিদে মিটেছে। এও তো এক গল্প।
নবমীর সকালে অঞ্জনের বলরামপুরের বাড়িতে যে গল্প উসকে দিয়েছে রামচন্দ্র মাঝি। হাত দেখার পর শুধু ঐ কথাটা বলে — বাঁচচা তিঁনটো বাঁচচা।
নিনার সঙ্গে পায়ে পায়ে ঘোরার সময় দেখতাম শীতের মধুপুরে ঐ অত বড় বাড়িটায় কত কত ধুলো। সেই জমা ধুলোয় কোথাও কোথাও আমাদের দু জনের পায়ের ছাপা আঁকা হয়ে যেত। কাছাকাছি। বড় কাছাকাছি।
জমা ধুলোর ওপর ডান হাতের তর্জনী ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে দু জনে দুজনের নাম লিখেছি। বড় যত্নে। আবার মুছে দিয়েছি।
ডাঁসা পেয়ারা চেবোনো মুখে চুমুর স্বাদ কেমন, তখনই তো তা জানার সময়।
সকালে উঠে তাকে দেখলেই বুকের ভেতর সাতটা পাখি এক সঙ্গে ডানা ঝাপটায়, নাচানাচি করে। সেতারের অনেকগুলে

া তারে এক সঙ্গে কে যেন আঙুল ছোঁয়ায়। সারা দিনে তখন কত কি রহস্যভেদ।
তুই অ্যাত মেয়ে ন্যাকড়া কেন রে! আমার পেছন পেছনে খালি ঘুরিস! নিনার চোখে কপট শাসন।
'মেয়ে ন্যাকড়া' — শব্দটা আমি সেই প্রথম শুনি। তারপর আর একদিন আরও একটা শব্দ — 'মাগীরাম'।
এসব কথা আমি আগে কখনও শুনি নি। ফলে জানতামও না। আমাদের বাড়িতে খারাপ কথা বড় জোর 'ভূত' বা 'শুয়ো ার'। শালা শব্দটা বাবা খুব রেগে গেলে কখনও কখনও বলতেন বটে। কিন্তু সেটাও বানান করে — তালব্যশ-এ আকার ল-এ আকার — এমন কি খুব রেগে গেলেও।
আজ এই নবমীর বিকেলে বলরামপুরে বসে বসে মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি কি মধুপুরের সেই বিশাল বাড়িতে নিনা আমায় 'মেয়ে ন্যাকড়া' বা 'মাগীরাম' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছিল?
পরে ও দুটো শব্দের মানে জেনেছিলাম। মেয়েদের গায়ে গায়ে যে সব ছেলে খুব বেশি ঘোরে আর সেই ছেলেরাও একটু মেয়েলি টাইপের তাদেরই ঐ দুটি নামে ডাকা হয় অনেক সময়।
শাশ্বতীর কাছে বহু বছর পর এই শব্দ দুটির মানে জানতে চেয়েছিলাম। নিজের পু ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের একটা পরিচিত মুদ্রা তৈরি করে শাশ্বতী বলেছে, হবে কোনো মেল শভিনিস্টিক প্যাঁচ। মেয়েদের ছোট করার কন্সপিরেসি।
মধুপুরের বাড়িতে একটা হলুদ রঙের পাখি এসে বসত আতা গাছে। সেই পাখিটার সঙ্গে মাঝে মাঝেই ফিস ফিস করে কথা বলত নিনা। ও কি কথা কইছে পাখির সঙ্গে জানতে চাইলে নিনা হেসে জবাব দিত — তোর মেয়ে ন্যাকড়ামি আর গেল না।
কথাটা শুনে খুব রাগ হ'ত। হলুদ পাখিটা কি পুষ ছিল? বহু বছর পর নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোর কাছে মিসেস রবার্টসনের বাড়ির ছাদের আলসেতে সেই হলুদ পাখিটাকে আমি আবার দেখি। দেখেই মাথার রক্ত গরম। খুব রাগ হয়ে গেল।
রাগ আরও বাড়ল যেদিন দেখলাম শাশ্বতী খুব মন দিয়ে আদর করছে পাখিটাকে। আদর করতে করতে কথা বলছে। কত রকম কথা।
এরকম কথা তো নিনাও বলত। কিন্তু সে বড্ড চুপিচুপি ফিসফাস। গাছ, ঝোপ, সবুজের আড়াল-আবডালে।
সেই হলুদ পাখি কে একদিন আমি শাশ্বতীর স্তন বৃন্ত খুঁটতে দেখলাম। সেদিন ঘন বর্ষা। খুব বৃষ্টি। বাস স্ট্যান্ডেদাঁড়িয়ে দাঁ ড়িয়ে বাস না পেয়ে বাড়ি ফিরে দরজার বেল টিপতে কাজের বাচচা মেয়েটি দরজা খুলল।
বললাম, ম্যাডাম কই?
শীলা নামে সেই কাজের কিশোরী আঙুল দিয়ে বন্ধ শোয়ার ঘরের দিকে দেখাতেই বিরক্ত হয়ে টোকা দিয়ে দরজা খুলি।
শাশ্বতী মেঝেয় দাঁড়িয়ে।
তার খোলা স্তনে ঠোঁট ছোঁয়ান সেই হলুদ পাখি।
বন্ধ জানালার ফাঁক আর ভেন্টিলেটার দিয়ে আসা মেঘলা আলো তার নগ্নতার কোনো ছায়া তৈরী করতে পারে নি। বরং পাখিটির ছায়া খুব বড় — অনেক বড় — অতিকায় এক মহাপক্ষির ছায়া হয়ে ঘরের শ্বেতপাথরের মেঝেয় লুটোচ্ছে।
শাশ্বতীর বয়েজ কাট। বরাবরই। অন্তত যত দিন আমি দেখছি। কিন্তু এখন তার ঘন কৃষ্ণ কেশ রাশির প্যান্ডেল দেখা কালি ঠাকুরের চুল। খুব দ্রুত সেই কেশমালা দীর্ঘ হতে হতে মাটি ছুঁয়ে ফেলছে। তরপর শ্বেতপাথরের মেঝে বেয়ে হিস হিস করে বয়ে চলেছে সেই চুলের ভার। যেন হাজার হাজার সাপ ঘুরছে ঘরের ভেতর।
আমি ভয় পেয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আর সেই পাখিটি — শাশ্বতীর কোলে ঠিক কোলে নয়, জোড়া বুকের ওপর দোল খাওয়া সেই পীত বিহঙ্গ নিজের গলায় কি একটা ডাক দিয়ে উড়ে গেল।
উড়ে তো গেল। কিন্তু কি করে পালাল ডানা মেলে? সমস্ত ঘর তো জানালা বন্ধের পর সিন্দুক একেবারে।
কোথায় গেল তাহলে পাখি?
কোথায় গেল?
আমায় দেখেই শাশ্বতীর সেই হিলহিলে মাথার চুল ঝপাঝপ ছোট হয়ে ফিরে এল আবার আগের জায়গায়।
শাশ্বতীর নগ্নতায় তখনও কোনো ছায়া নেই।
হঠাৎই দু পা এগিয়ে এসে আমার গালে ঠাস করে সপাটে একটা চড় মারল শাশ্বতী।

যন্ত্রণায় আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল — উফ্।
এ বাড়িতে বিকেলে চায়ের সময় রামচন্দ্র মাঝিও ছিল।
একটু একটু করে সন্ধে নামছে দূরে।
একটা কাপের চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাচ্ছে রামচন্দ্র।
কি রে রামদা! গেঁড়ুয়া যাব পরশু?
হঁ। চঁল নাঁ ক্যাঁনে।
পরশু কি তোর ছুটি?
লিঁয়ে লিঁব আঁইজ্ঞা।
আপনি কি গেঁড়ুয়া যাবেন পীযূষদা! রামদার বাড়ি?
তোমরা যদি যাও, যাব।
হাঁপনি কঁখনও মঁধুপুরে গেঁছেন? হঠাৎই রামচন্দ্র মাঝি জিগ্যেস করল পীযূষকে।
মধুপুর! কই না তো। কেন, মধুপুরের কথা আসছে কেন?
নাঁ, এঁমনি। এঁকবার যাঁবো ভাঁবলম।
অ্যাত জায়গা থাকতে তুই মধুপুর যাবি কেন রামদা?
এঁমনি। ভাঁবলম।
তোর যেমন কথা রামদা! কিছুর থেকে কিছু নেই। মধুপুর। এখান থেকে টানা যেতে তোর জীবন বেরিয়ে যায়। তুই যাবি মধুপুর! ছাড়। দুটি মুড়ি খাবি রাম।
হঁ। খাব। বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ও নাড়ল রাম।
সীমা ভেতরে চলে গেল মুড়ি আনতে।
তিন্নি আর মুন্নি রামচন্দ্র মাঝির বেশ কাছে সরে এসে বলল, রামজ্যেঠু তুই একটা গল্প বল।
বঁলব বঁলব। বলতে বলতে ঘাড় নাড়ল রামচন্দ্র। আর তখনই লোডশেডিং হয়ে গেল।
মুড়ির বাটি নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে সীমা বলল, উফ, আর পারা যায় না বাবা। এই পুজোর দিনেও লোডশেডিং। কোথায় বাচচারা একটু আনন্দ করবে, তা নয়! চারদিকে অন্ধকার।
হারিকেনটা জ্বালাও তাড়াতাড়ি।
খানিক্ষণের মধ্যে প্রীতিকণা লণ্ঠন রেখে গেলেন।
বল রে রামজ্যেঠু। গল্প। একসঙ্গে সুর ধরল তিন্নি মুন্নি।
সেঁ ছিঁল এঁক রাঁজকইন্যা। উঁয়ার কেঁশ যঁখন তঁখন কঁমা বাড়া হঁইত। আঁর ছিঁল এঁক পিঁলা পাঁখি।
পিলা পাখি মানে ? তিন্নি তাকাল অঞ্জনের দিকে।
পিলা পাখি মানে হলদে রঙের পাখি। হলুদ পাখি।
হলুদ পাখি! শব্দটা শুনেই ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল পীযূষ।
তো সেঁই পাঁখি এঁকদিন গঁল্প কঁইরল রাঁজকইন্যার সঙ্গে। আঁর তাই দেঁইখ্যা রাঁজকুমারের তোঁ বুঁক ফাঁইটে যাঁয় হিংসায়।
গল্পেও আমার কথা! ভেতরে ভেতরে চমকাল পীযূষ। রামচন্দ্র মাঝি আমায় কি জোরজার করে নিয়ে আসতে চাইছে একটা গোল গল্পের ভেতর। তার মধ্যে কিছুতেই ঢুকতে চাই না যে।
তারপর কি হলো বল!
পাঁখি তোঁ আঁইসে গঁল্প কঁরে। রাঁজকুমার জাঁইনতে পাঁরেক লাঁই। এঁমনি কঁইর‍্যে দিঁন চঁইল্যে যাঁয়। শ্যাঁষে এঁকদিন খঁবর পেঁইয়ে —
কে খবর দিল রাজপুত্রকে। জানতে চাইল মুন্নি।
কেঁ আঁবার! কঁটাল হঁব্যেক।

কঁটাল কে বাবা? মুন্নি জিগ্যেস করল।
আঃ! গল্পের মধ্যে কেন বার বার কথা বলছ? কোটাল মানে কোটাল। যেমন মন্ত্রি, সেনাপতি, পাত্র, মিত্র, অমাত্য। তেমনই কোটাল।
কোটাল তো বলছে না বাবা রামজ্যেঠু। বলছে কঁটাল।
ঐ রামজ্যেঠু যেমন পারে, তেমন বলেছে। এখন চুপ করে গল্প শোন।
কোটাল মানে কি বাবা? মুন্নি আবারও জিগ্যেস করে।
কি করে বোঝাই বল তো! কোটাল মানে ধর অনেকটা পুলিশের বড় কর্তা। আই জি। কিংবা পুলিশ কমিশনার। কি, বুঝেছ?
মুন্নি ঘাড় নাড়ল। বুঝেছে। তারপর রামচন্দ্র মাঝিকে বলল, বল, রামজ্যেঠু।
হঁ। সেই কঁটাল আঁইজ্ঞা খঁপর দিছে। তঁখন তোঁ রাঁজার ব্যাঁটা তঁলোয়ার লেঁ সেঁ পাঁখিটোর গঁলাটো কাঁইটলেন।
ইস, গলা কেটে দিল রাজপুত্র অত সুন্দর পাখিটার! কষ্ট হলো না! বলতে বলতে মুন্নির চোখে প্রায় জল আসে আসে।
হঁ গঁলাটো কাঁইট্যে দিঁলেন আঁইজ্ঞা।
তারপর?
ইঁয়ার পঁর সেঁই পিঁলা পাঁখি ডাঁইন হঁইয়ে গুঁরছে। কঁখন পাঁবে রাঁজার কুঁমারকে। পাঁবে তোঁ গাঁড়টি মঁটকাইবে। খেঁইয়ে লিঁব্যে এঁকদম। এঁকদম খুঁন চুঁষ্যে খাঁব্যে।
পীযূষ লক্ষ করল বলতে বলতে গলার স্বর, মুখের চেহারা বদলে গেল রামচন্দ্র মাঝির। হাতের মুদ্রায় মোচড়ানির ভাব দেখিয়ে সে গলা মুচড়ে দেয়ার কথা বলছে। কথার সঙ্গে সঙ্গে তার হাঁ-মুখ বড় হচ্ছে। সেই মুখের ভেতর কালচে ছোপ ধরা এবড়ো-খেবড়ো দাঁত। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা বেশ ছমছমে লাগছে পীযূষের কাছে।
মনে মনে গল্প গোছাচ্ছে পীযূষ। মধুপুরে সেই পুরনো ভাড়াবাড়ি আর বাগানের ভেতর নিনার সঙ্গে কথা বলা। ঘোরা। স্তব্ধ দুপুর আরও নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝে পায়রার ডানার শব্দ। মন কেমন করা ঘুঘুর ডাক। মাঝে মাঝে হলুদ পাখির আসা।
তারপর শাশ্বতীর সঙ্গে মিসেস রবার্টসনের ভাড়া ফ্ল্যাটে। সেখানে কোনো সন্ধ্যায় পিয়ানোর বিষণ্ণ সংলাপ। পরিচিত গত বাজে। এও তো আর একটা গল্প। মধুপুরের বাগানে দেখা সেই হলদে পাখি কি করে যেন উড়ে আসে মিসেস রবার্টসনের ছাদের কার্নিশে।
'মেয়ে ন্যাকড়া', 'মাগীরাম', 'মেল শভিনিজম' — শব্দগুলো ঘুরপাক খায় এই দুটি গল্প গাঁথার অনুষঙ্গ হিসেবে।
সেই আটষট্টি-ঊনসত্তরেই কি রেকর্ডে শোনা গেছিল 'মনে কর আমি নেই বসন্ত এসে গেছে। কৃষ্ণচূড়ার বন্যায় চৈতালী ভেসে গেছে —'? এগানটা কোনো দিন গেয়েছিল নিনা? তখন কি তার কোলে আমার মাথা? কিংবা হাতে হাত? অথবা কিছুই নয়। নিনা বা শাশ্বতী বলে কেউ কোনো দিন ছিল না কখনও? ছিল না মধুপুরের বাগান, বিশাল বাড়ি, মিসেস রবার্টসনের একটু পুরনো ডিজাইনের ভাড়া ফ্ল্যাট।
এসবই কি কল্পনা? আদপে ছিল না কিছুই? সবই কোনো অলীক-বিভ্রম! কিংবা সত্যি সত্যি সব কিছুই ছিল। আছে। থাকবে। ভাবতে ভাবতে মাথা ঘুরে উঠল পীযূষের।
কাছেই স্টেশনের গায়ে দূর্গা-প্যান্ডেলের ঢাক বাজছে। স্বপ্ন কিংবা কল্পনা — কোনটা আসলে কি, এ ব্যাপারে পীযূষ কোনো ভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।
রামচন্দ্র মাঝি বলে যাচ্ছে, তারপর তো পাঁখিটোঁ দাঁইন হঁইয়ে রাঁজার ব্যাঁটা রেঁ খুঁইজছে খুঁইজছে —
এসব বলতে বলতে রামচন্দ্র মাঝির গলা আরও রহস্য ঘন হয়ে উঠছে।
পীযূষ দেখল একটু দূরে, যেখানে হারিকেনের আলো থমকে গেছে, ঠিক সেই সীমানায় স্থির হয়ে আছে একটা বড়সড় পাখির কালো ছায়া। সেই ছায়ায় পাখি দেখে নিদাণ ভয়ে সিউরে উঠল পীযূষ ভদ্র।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com